প্রকাশক : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর প্রকাশনী
১৯এ, কেদার বসু লেন
ভবানীপুর, কলকাতা-৭০০০২৫

প্রথম প্রকাশ : ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

গ্রন্থ পরিকল্পনা : অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শুভাপ্রসন্ন

অলংকরণ : চিত্ত দাস

প্রাপ্তিস্থান : কলেজ স্ট্রীট ও অন্যান্য স্থানের সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

মুদ্রণ অমল বন্দ্যোপাধ্যায়
মৌ প্রেস
১৯এ, কেদার বসু লেন
ভবানীপুর
কলকাতা ৭০০০২৫

বাঁধাই ব্লু বুক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস,

উৎসর্গ

শ্রীমতী নিভাননী দেবী

শ্রীমতী বিভাবতী দেবী

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রস্তুতি প্রসঙ্গে

'খুঁত' নামে একটি কবিতায় প্রেমেন্দ্র মিত্র জানিয়েছেন, 'নিরেট সত্য নিখুঁত মাধুরী ছাপানোই পাবে কিনতে'। হাতের লেখায় 'কিছু ভুল কিছু কাটাকাটি নিয়ে' যে ব্যক্তি-পরিচয়, ছাপার হরফের 'নিখুঁত মাধুরী'তে তা হারিয়ে যায়। 'ছাপার অক্ষরে ব্যক্তিগত সংস্রবটি নষ্ট হয়—সে অবস্থায় এইসব লেখা বাতি-নেবা চীন লণ্ঠনের মতো হাল্কা ও ব্যর্থ হতে পারে।'—এ আশংকা প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও।

১৯২৬ সালে কবিগুরু 'লেখন' ছাপিয়েছিলেন জর্মনিতে। এখন আমাদের দেশেই হাতের লেখা ছাপানো সম্ভব। বলা যায়, প্রিয় কবিদের কাছে পাওয়ার এ এক দুর্লভ সুযোগ। কবিকণ্ঠে কবিতা শোনার মতো কবির পাণ্ডুলিপি পাঠও একটি রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

সামনে বইমেলা। নতুন বইয়ের পরিকল্পনা তাই সহজেই বাতাসে ছড়াচ্ছে। এই আবহাওয়ায় বন্ধু অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান বইটির পরিকল্পনা পেশ করলেন। তাঁর কথা মান্য করে কাজে নামলাম। এত অল্প সময়ে বইটির রূপায়ণ তবু যে সম্ভব হল তার একটিই কারণ—প্রবীণ কবিদের নবীনতা। যত দ্রুত সম্ভব আমার প্রার্থিত কবিতাগুলি তাঁরা লিখে দিলেন। স্মরণীয় কবিতার সংকলনে এ অভিজ্ঞতাও আমার কাছে কিছু কম স্মরণীয় নয়।

দূর-প্রবাসী কবি অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ সম্ভব নয় বলে তাঁকে এ সংকলনে উপস্থিত করতে পারি নি। প্রস্তুতির দ্রুততায় আরও কয়েকজন প্রবীণ কবির কাছে যেতে পারি নি। এ সবই অপূর্ণতা। 'মর্ত্যের মাটিতে যে কোন বৃত্তই অসম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ বৃত্ত শুধু আকাশেই সম্ভব।' অতএব আমার এই অসম্পূর্ণ কাজটিও পাঠকের হাতে তুলে দিলে ক্ষতি কী?

একটি পুণ্যদিনে বইটির প্রকাশ ঘটছে। বাংলাভাষাকে ভালোবেসে যাঁরা প্রাণ দিয়েছিলেন, একুশে ফেব্রুয়ারির সেই অমর শহীদদের স্মরণ করি, প্রণাম করি।

রমাপ্রসাদ দে
শম্পা মিজানগর
সরকারী আবাসন

কবি তব মনোভূমি রামের জনম স্থান
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯০৪

অরুণ মিত্র ১৯০৯

দিনেশ দাস ১৯১৩

সমর সেন ১৯১৬

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯১৯

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯২০

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৯২০

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ১৯২৪

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আধুনিক কবিতার পুরোভাগে যাঁরা, প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁদের অন্যতম। তাঁর মন অসুখী ও জটিল হলেও তিনি অস্বাস্থ্যকর জটিলতাকে প্রশ্রয় দেন নি। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা বাইরের দিক থেকে সহজ ও সরল, কিন্তু ভেতরে গভীর সুদূরতার দিকে মনকে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। যথার্থ কবিমনের অধিকারী তিনি; এবং সেই মনকে অল্প কয়েকটি কথায় প্রকাশের ক্ষমতাও তাঁর অসামান্য। তাঁর রচনায় বহিরঙ্গ আতিশয্য নেই, শৈলীতে দুষ্ট মুদ্রা নেই। তাঁর বর্ণনা সুমিত ও ব্যঞ্জনাময়। তাঁর কবিতায় প্রথমেই নজরে পড়ে মুক্তমনের প্রতিফলন; সেই মন সংস্কারবিহীন কিন্তু সংস্কৃত। এ-যুগেরই মানুষ তিনি। যুগের জটিলতা, যুগের নিরাশার হাত ধরেই তাঁকে জীবনে পথ হাঁটতে হয়েছে। কিন্তু যে-কাব্যপ্রাণতা জটিলতাকে সরল করে তোলে, নিরাশার বুকেও আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে দেয়, তার চাবিকাঠির খোঁজ তিনি অনায়াসেই পেয়েছেন।

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায়

১৯৬০

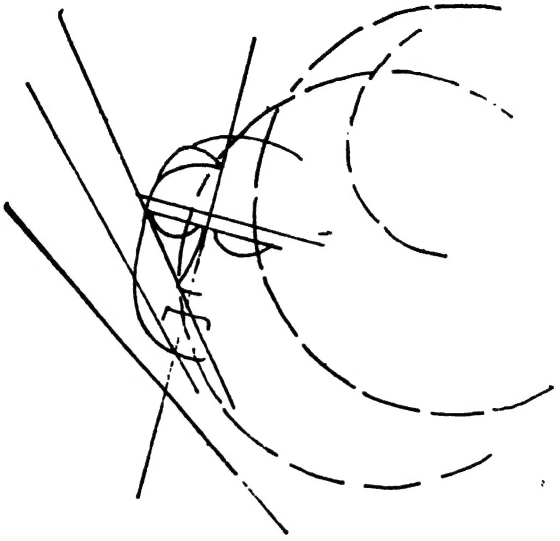

প্রিয়বন্ধু [illegible]-

এ মাটির- ঢেলা কবে কে ছুঁড়িল
সূর্যের পানে তাই
পৃথিবী যাত্রা নাম !
লক্ষ্য-ভ্রষ্ট- চিরদিন সে যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফেরে
সূর্যের- চারিধাম,
তবুও সন্ততি আমাদের ও তাই
ধর্ম সে সন্ধান,
লক্ষ্য সিদ্ধি হলি :
মোদের সকল পুরুষের সাধ এমনিতা কেমন করি'
লেখেছে সমিন ধূলি।

মাটি ও পাথর কাটি যার কুঁদি
দেবতা গড়িনু দেব
মাগিলাম কল্যাণ ;
বেদীমূলে তার তবু লোনিতের দাগলেগে আছে
— দেবতার অপমান।

কত নীরবে কত সমাধিতে সমিধ লইয়া হোম
যে আলো জ্বালায়ে জ্বলি ;
দেখি তার জ্যোতি বিফলে মিলায়
নাহে শুভ্র ভস্মাবশ
সলিল শিখাজ্বালি ।

যাহা বন্যায় ধাবিত যাহারে
তাহারে পারাই বেড়ি
— সে মেরে আপন ভাই !
লীলন যাহারে শিরে তরুবর
তারে মূলে আসে
দুই হাতে আসনাশ ।

তারকালোকের জেনেছি চন্দ্র
সূর্যোদয়ের বাণী
পৃথিবীতে ভালোবাসা ;
তবু হিংসার যন্ত্র কারায় সভয়ে লালন করি
শুধু বাঁচিবার আশা !

পরম ধ্যান্ত দেবতা মোদের নয়নে [illegible] অহংকার,
হিংস্র নখর হাতে;
তারি তার শক্তি-সর্বনাশিনী
তবুও তাহারে হবে
তারই মূল ইশারাতে।

পেয়ে-প্রতী পৃথিবীর তাই যে আদিম অভিশাপ
বহি মোরা চিরদিন;
আকাশের আলো যত ধরি তা
মিলিবে না কভু তা
এ মাটি-পাঁকের খাঁজে

সাপ

প্রথম সাপটা দেখার নিথর পাথর সম্মোহিত
কোন সে আদিম মন্ত্র অথবা
সম্বেদনের দ্বিধা।
আঁধার তোমার ছায়া ভিড়ে
জলে খোলে কুণ্ডলী!
তারপর সাপ প্রথম দেখবে
কেঁপে ওঠা শরীর।
কাঁটা দেওয়া ভাস সভয়ে শুনবে
শোনন সঞ্চরণ।
— শোনা না শোনার সীমানায় স্তব্ধ
উদ্ধতা শিহরিত।

সব শেষে এক সাহসী সকাল
সহসা অতল থেকে
বিষের হিংসা ছেঁকে দিয়ে এলে
রোদ্দুরে মেলবে কি?
ছবি মেলাবে, ধূলা-মাটির বিবরের
সরীসৃপের বিশ্ব ফণা সার
পাখিদের নীল ছুটি!

অরুণ মিত্র

অরুণ মিত্রের কবিতা আপাত-সহজের আড়ালে আমাদের এক কঠিন বিপন্ন সময়ের আর তা থেকে উৎরে জীবনের স্বতোৎসারিত এক নির্ঝরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। যে-পাথরে এই নির্ঝরের মুখ, সে কিন্তু শক্ত নিখাদ পাথরই। এক প্রচ্ছন্ন অথচ খর দ্যুতিতে তাঁর কবিতা অনেক কিছুই তখন আমাদের দেখে জেনে নিতে বলে। আর এই কবি এক প্রগাঢ় মমতায় আমাদের সেই ধরা-ছোঁয়ার জগতটিতে পৌঁছে দিয়ে যান। আধুনিক বাংলা কবিতায় এইখানে তাঁর জুড়ি নেই। এই যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা, বিশেষ করে স্পর্শগ্রাহ্যতা। মাপা-বাঁধা ছন্দের বাঁধনটি শেষ পর্যন্ত তিনি খুলে দেন, চলে আসেন গদ্যছন্দের আটপৌরে ঘরোয়া এক বিন্যাসে, অন্তরঙ্গ কথকতার মধ্য দিয়ে তিনি কবিতার এক আশ্চর্য রূপবদল ঘটিয়ে দেন, "মুখের ভাষা যে ফুলের মতো জীবন্ত হতে পারে তা তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাস হয়।"

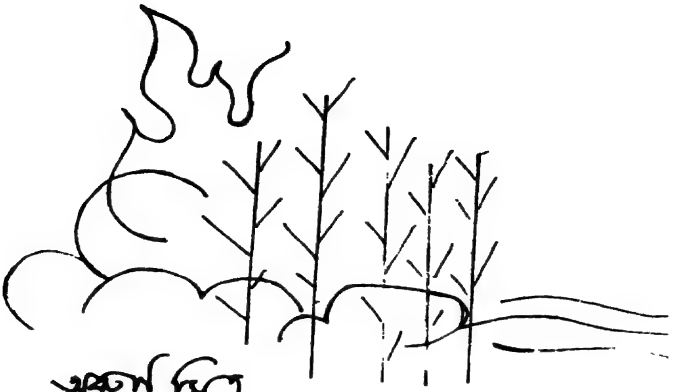

অরুণ মিত্র

একটি শিখাও আর

একটি শিখাও আর প্রতিবিম্ব ফেলে না
তারা অন্ধকারের বিকেলে নিবে গেছে,
শরীর আর বৃক্ষ আর পাথরের আগুন
পৃথিবীর জঠরে ফিরেছে,
পশ্চিমের দীঘিতে হাওয়া মরে
শীতল বৃত্ত পাথার বৃক্ষে শরীরে।

কিছুই আলোকিত নয়, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা
অথের শাখার কঠিন অন্ধকারের
অপরিচয় থেকে আপন হওয়ার মতো;
শিকড় যতদূর থেকে রস টানে
ততদূর রক্তের রাত্রি ছড়ানো,
জীবন আর অস্পষ্টতার
শুধু দুই চোখ বিস্ময়ের আকাশ।

পশ্চিমের দীঘিতে ধরা পড়া
বিস্মৃতির হাওয়ার বৃত্ত,
সময়ের এইখানে অবগাহনের কেন্দ্র
গাঢ় থেকে গাঢ়তর নিমজ্জন।
কিন্তু একটি অনির্বচনীয় ঝরির জন্যে
হেমন্তের দৃশ্য নিস্তব্ধ...
আমি প্রতীক্ষায় রয়েছি, অন্তিম হৃদয়।

ধূর্তি দালান মুখ

শহরের খবরই বলবার ছিল। পাথরগুলো খাটছে। এত বছরের ঝড়জলরোদ-খাওয়া পাথর। একের পর এক খোদাই-করা অক্ষরের ভাঙচুরে যেন এক নতুন এক ভাষার ছাঁচ। ধূর্তি এবং দালানের পোড়ায় অসম্ভব তাপের কথাই আমি বলতে চাইছিলাম। কিন্তু আমাকে চুপ করে থাকতে হল। আমার একান্ত কাছের মুখগুলো বরফের মতো গলে যাচ্ছে দেখলাম।

গর্জনের সামনে

গর্জনের সামনে একটা তারা কাঁপছে। তারে দেখার পরই আমরা বেরিয়েছিলাম, বুলা আর আমি। একমনা হাঁটছিলাম। আমরা সারা পথ নানান কথা বলছিলাম। মানুষ, চতুষ্পদ, পাখি, ফল, কাঠবিড়াল, আমরা আর ঐ তারা। সবটাই তো আমাদের ভালো লাগা। আমরা বুঝেছি আমাদের যে-বুদ্ধি আছে তা দিয়ে কোনো হিসেব মেলানো যায় না। আমরা তাই এই ভাবেই বলি। তোমার সঙ্গে চলতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে দেখতে আমার ভালো লাগে, তোমার সঙ্গে ভাবতে আমার ভালো লাগে।

তারাটা যখন সবে ফুটছে তখন আমরা বেরিয়েছিলাম। আমরা কোনো কিছু থেকেই আলাদা হয়ে যাইনি। এই দিন এবং এর আগের সবগুলো দিন এবং সবগুলো সন্ধে আর রাত আমরা আমাদের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। আমরা কথা বলছিলাম। কথাগুলো যেন ঘুরে ঘুরে এক সাঁকো, তার উপর দিয়ে আমাদের সমস্ত ইচ্ছে সমস্ত বোঝাবুঝি পারাপার করছিল। কষ্ট কি ছিল না? ভীষণভাবেই ছিল। খাবারের দোকানের কাছে ভিখিরি ছেলেটা মোনোদিন আমাদের নজর এড়ায়নি। এবং ঘরে বাইরে যত আছে তাই চিৎকার আমরা শুনেছি, সব আমাদের কানে লেগে ছিল। তবু আমরা সবাই হাসিয়ে উঠছিলাম। এই সমস্তকে শুধুরে- নেওয়া আর একটা সময়ের কথা আমরা ভাবছিলাম, বলছিলাম। আমাদের বলা এবং শোনা অনেক কবিতার বাসনা আমাদের উছলে তুলছিল।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে কতদূর এসেছি? যতদূরই হোক, ফিরবার ভাবনা আমাদের মাথায় নেই। কিন্তু ঐ তারা এখন কাঁপছে। আমি বুলার হাত শক্ত করে ধরে দাঁড়িয়েছি। আমরাও গর্জনের সামনে।

দুপুরের সূর্য

দুপুরের সূর্য তাড়িয়ে নেয় আর আমি অনুভব করলাম
তোমার সন্দন থমথমে রক্তের মতো
তোমার শুকনো মুখ শস্যের শিকড়ে শিকড়ে ছাওয়া
অনুভব করলাম।

দৃশ্য

নিঃসঙ্গ ছেলেটা আবার এই তো দাঁড়িয়ে ঢালু পাড়ে পিছনে
অজগর মতো নদী যা কিছু দেখা সর্বাঙ্গে মুখে দীপ্ত স্যাঁতু বানানো
আর এপারে সবুজ বাস্তবে খেরাও নারকেল গাছের মাথায় ঘাসের
চাপড়ায় ধানখেতে মিশে বুঁদুলের মাচায় আরো কত কত আবার
বারান্দার ঘরে বাসি চায়। আর কোন ছেড়ে বাজারে বাজারে দুনিয়া
ঘুরে উদোম ছেলে ঘের এসে পড়েছে বুকের ওপর। তোর হাত দুটো সবই
সাপটে ধরতে গিয়েছিল কিন্তু খুদে আঙুলগুলোর ফাঁক দিয়ে
গলগল করে, যেন রক্ত, বেরিয়ে গিয়েছিল চালগুলো আনাজসবই।
মাটি মরা স্নেহময়ী চাদরকে ছবির ফুল ফুটিয়ে ছবির ফল ফলিয়ে
ঢেকে সাজিয়েছে মন্ত্রিখানে যে আহামরি কী নিদ্রাময় হয়ে আছে।

নিসর্গের বুকে

আমি এত বয়েসে গাছকে বলছি
তোমার ডাঙা ডালে সূর্য বসন্ত
হা: হা: আমি গাছকে বলছি
অন্ধকার হয়েছে আর আমি নদীকে বলছি
তোমার মরা খাতে পরী নাচাও
হা: হা: আমি নদীকে বলছি
খরায় মাটি ফেটে পড়ছে
আর আমি হাঁটছি রক্ত পায়ে
যদি দুপুরটা বীজ ভিজে ওঠে
হা: হা: যদি দুপুরটা –
নিসর্গের বুকে আমি হাড় বাজাচ্ছি
আর নাদারির মতো হেঁকে বলছি
এই অন্তরাল হয়ে তবে একমাঠ ধান
ঝিঁঝি হতেন প্যাঁচা শেয়াল
অনুযায়ী আর অন্তরায় রক্ত বুনছে
আমি বলছি একমাঠ ধান...
হা: হা: হা: হা:

এত সব চিনিয়েছিল

আমাকে এত
সময় রক্তস্রোত আরম্ভের পথ
ইস্পাত খলায় খুঁজলো মাটি আর মৃত্যু
কিন্তু ও আমাকে দেখায় নি হাসপাতাল
চিকন জলে মুখ দেখবার আয়না।
ও নিশ্চয় জানত একলা কোথাও ওর যাবার নেই
আমারও নেই,
ও নিশ্চয় জানত সময় দাগা রয়েছে ওর মুখে
আমারও মুখে,
একলা নয় একলা নয়,
তাই বুঝি অগুনতি মানুষের মধ্যে ও মিলিয়ে গেল
তারপর আমি শুনেছি এখনো শুনছি
বিশ্বোরন তারস্বর উড়াল গান,
আমি অগুনতি মানুষের মধ্যে ঘুরছি
আর চব্বিশ ঘন্টার তাপ আমার গায়ে লাগছে
আমার কামিজের তাপ।

দিনেশ দাস

একটি লেখা ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকমহলে হৈ চৈ পড়ে যাওয়ার ঘটনা সাহিত্যে কদাচিত ঘটে। তিরিশের শেষাশেষি আর চল্লিশের গোড়ার দিকে এ জিনিস আমরা দুবার ঘটতে দেখেছি। প্রথম, দিনেশ দাসের 'কাস্তে' কবিতা। দ্বিতীয়, সুবোধ ঘোষের 'ফসিল' গল্প। নজরুলের 'বিদ্রোহী'তে বোধ হয় ছিল আরও বড় রকমের চমক। তবে সে আমাদের জ্ঞানে নয়। কেন কিভাবে এ জিনিস ঘটে বলা শক্ত। তবে এই তিনেরই এক জায়গায় মিল আছে। সে মিল হল তখনকার সমাজ-মানস। ভেতরে ভেতরে যা গুমরে উঠছিল, ভাষা দিয়ে তাকে বাইরে এনে দেওয়া। সবাক ছবি ফোটানো। এমন ছবি যা প্রতীকের তাৎপর্য পাবে। দিনেশ দাসের 'আকাশের চাঁদ হল কাস্তে' তাই শুধু স্মরণীয় একটি লাইন হয়েই থাকে নি। রাতারাতি একটি প্রবাদে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। আর কবিতায় তাঁকে শিরোপা দিয়েছিলেন একই সঙ্গে দুই জ্যেষ্ঠ কবি—সুধীন্দ্রনাথ দত্ত আর বিষ্ণু দে।—চার পাশে যা ঘটছে, ঘর আর বাইরের টানাপোড়েন, ভালোমন্দের দ্বন্দ্ব, জীবন আর মৃত্যু—দিনেশ দাসের কবিতায় সবই আছে। সেই সঙ্গে আছে বেদনাবিধুর সেই মন যার হাতে ধুলোমুঠো সোনামুঠো হয়।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯৮৩

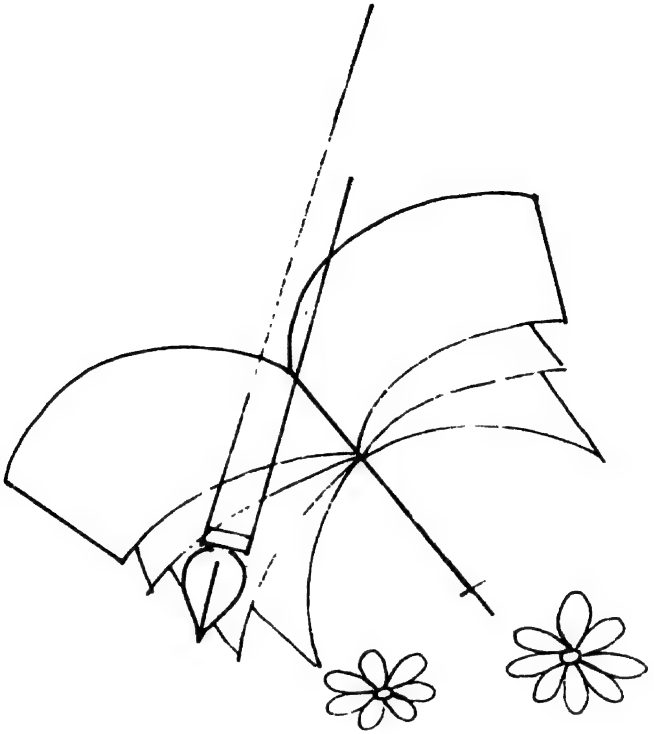

কাব্যচিন্তা

দিনেশ দাস

তাঁতীরা যেমন ক'রে গুটিপোকা থেকে
সোনালী রেশমী সুতো কাটে পর পর,
কবিও তেমনি বোনে শব্দের গুটি থেকে
কবিতার রেশমী কাপড়।

কাস্তে

দিলেশ দাশ

বেয়নেট হ'ক যত ধারালো
কাস্তেটা ধার দিও বন্ধু,
শেল আর বোম হ'ক ভারালো
কাস্তেটা শান দিও বন্ধু!

বাঁকানো চাঁদের সাদা ফালিটি
তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে?
চাঁদের শতক আজ নহে তো,
এ যুগের চাঁদ হ'ল কাস্তে।

লোহা তার ইস্পাতে দুনিয়া
যারা কাল করেছিল পূর্ণ,
কামানে কামানে তোকাটুকিতে
নিজেরাই চূর্ণ-বিচূর্ণ।

চূর্ণ-এ লৌহের পৃথিবী
তোমাদের রক্ত-সমুদ্রে
ঘনিত গলিত হ'ল মাটিতে,
মাটির — মাটির যুগ তুর্বী।

দিগন্তে মৃত্তিকা ঘনায়
আসে ওই, চেয়ে দেখ বন্ধু!
কাস্তেটা রেখেছ কি শানায় —
এ-মাটির কাস্তেটা বন্ধু!

জার্মান : হাসপাতালে

দিলেন দাস

পিংড়ি হাসপাতালের নীলচে কাচের ওপর
আমার হৃৎপিণ্ডের আলো ছায়ায় ঢেউ :
আমার অশান্ত হৃদয়ের সাত সতর বছরে এসে
হঠাৎ মুখোমুখি দেখা।
ওর দু'পাশে ওঁরা তাঁরা তুষারে ঢাকা
দুটি মসমসে যেন সুভাষ-কবি গোবিন্দ দাসের
দুটি প্রিয়তমার মত কবি-সম্বন্ধে ধীর রেখাছ।

গত বছর স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ব্যবস্থায় কেবিনে শুয়ে
ডাক্তার সি.সি. কারের নির্দেশে নিষ্ঠার সাথে
অনেক তত্ত্বাঁধ বড়ি গিলেছিলাম
এক একটি সত্যের ব্যাপসুলের মত :
তখন দু'একটা ধমনীর রক্তস্রোত হঠাৎ ফেটে পাকিয়ে
হৃৎপিণ্ডের পথে উপনদীর মত বাধা সৃষ্টি করেছিল,
দুয়ের মধ্যে এক অদ্ভুত সম্পর্ক —
তবু 'হার্ট-অ্যাটাক' মানব-জীবনে এক আশ্চর্য ঘটনা।

এবার কিন্তু মসমসে দুটোর ওপর শ্লেষার তুষার
বরফের মত কঠিন হয়ে গেছে ধীরেই ;
ফিকে-নীল কাচের পর্দায় সৃষ্টি দেখতে পাচ্ছি
আমার সময় থরথর করে কাঁপছে
দুটি প্রিয়তমার নিবিড় কবার আলিঙ্গনে।

টি.ভি-র কাচে স্পষ্ট দেখছি,
আমার হৃৎপিণ্ডের রং কালচে জোয়ারের কবির মত।
এটা তত কালো হল কী করে ডাক্তার সমীর গুপ্ত ?
সার্জেন হলেও তিনি কবিপ্রাণ, বুঝলেন,
"পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি" — একি কবি ভুলে গেলেন ?
বললুম, "সুকান্ত আমার আগেই তো আমি
নতুন কুমড়ো চাঁদকে, ঝুরির ঈদের চাঁদকে,
লোহার কাস্তের হাতিয়ার করে নামিয়ে এনেছি
পঁয়তাল্লিশ বছর আগে।

হৃৎপিণ্ডকে ভেবেছিলুম একটি টেবিলে আইনস্টাইনের বাটি,
এমন দেখছি, একটি আঠালো কালো সিসের ঘটি,
এই-কি আমার হারানো হৃদয়
যে রাতের ব্রহ্মে মত্ত এলা এলা গান গায়।

ডাক্তার মোয়ার বলালেন, সহকারী ডাক্তার মেন ও,
"ডান আছেন? বুকের স্টেথস্কোপ-বেই কো?"
"না-না, ডান আছি সন্ধানের নেশায়ত্তে,
তবে মোয়ারসাহেব, আমার বেচারী হৃৎপিণ্ডকে
এবার ছুটি দিন। বেচারী অনাবশ্যি নিরলস রাতদিন
হার্ট-মেশিনে সতরবার ঠুকঠুক করে ডেকে আসছে।
কাট-পছন্দ চাকরীর পর সন্ধানেই ছুটি পায়
ডাক্তার আমাকে 'রিটায়ার' করেন পঁয়ষট্টিতে,
আর কেন? আমার হারানো হৃৎপিণ্ডকে এবার ছুটি দিন।
মিস্টার-অধিনায়িকা কুমারী সুষমা কর ও শ্রীমতী স্মৃতি মতের
চোখে হাসির ঝিলিক, ঠোঁট কৌতুকে বাঁকা।
"কী হবে ডাক্তার খাঁর-করা হৃৎযন্ত্র নিয়ে
যার নাম "লেন-মেকার"?
লেন-মেকার বলালে হয়তো আমি কল্পনার ডানায়
স্বপ্নের সীমানায় পৌঁছোতে পারতুম একদিন —
হয়তো শ্রীমানময় যোগের মাত্রাদিয়ে জানাতে পারতুম
এই আকাশ অনন্ত না সান্ত, অসীম না সসীম?
আইনস্টাইনের ডানায়, শক্তিতত্ত্বে, না নেপেটিউ
অঙ্কের কথায়, প্যারাবোলা না হাইপারবোলা?
আইনস্টাইন নিরুত্তর, সত্যেন বসুও।
কারণ এই স্নেহের কারুকার্য কি মাপবে?
এই-নীল আকাশ, এই সান্ধ্যপৃথিবী
এই-ভূভুর স্বঃ কি সীমাহীন?
হে সবিতা, হে ওর্ধাদেব! আমাকে লেন্সমুক্ত দাও।

সমর সেন

সমর সেনের কবিতায় বিদ্রোহের ভাব ও ভঙ্গি সুস্পষ্ট। তাঁর কবিতা গদ্যে রচিত, এবং কেবলই গদ্যে। আমার ধারণা ছিলো পদ্যরচনায় ভালো দখল থাকলে তবেই গদ্যকবিতায় স্বাচ্ছন্দ্য আসে, কিন্তু সমর সেনের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখলুম। তিনি গদ্যে ছাড়া লেখেননি, এবং কখনো লিখবেন এমন আশাও আমার নেই। এখানে এটা বিশেষ ক'রে উল্লেখ্য যে তাঁর গদ্য-ছন্দ বাংলা ভাষায় অভিনব, রবীন্দ্রনাথের বা অন্য কোন কবির ছাঁচে ঢালাই করা নয়। ... নাগরিক জীবন আমরা আরম্ভ করেছি অনেকদিন ; কিন্তু আমাদের কাব্যে এ-পর্যন্ত বেশির ভাগই পাওয়া গেছে রাখাল-বালকের চোখে পল্লীপ্রকৃতির ছবি। নাগরিক জীবনের খণ্ড খণ্ড ছবি বা উল্লেখ কোনো কোনো আধুনিক কবিতে থাকলেও, সমগ্রভাবে আধুনিক নগর-জীবন সমর সেনের কবিতাতেই ধরা পড়লো। সমর সেন শহরের কবি, কলকাতার কবি, আমাদের আজকালকার জীবনের সমস্ত বিকার, বিক্ষোভ ও ক্লান্তির কবি। ঠিক যেন শহরের সুরটি ধরা পড়েছে তাঁর ছন্দে।

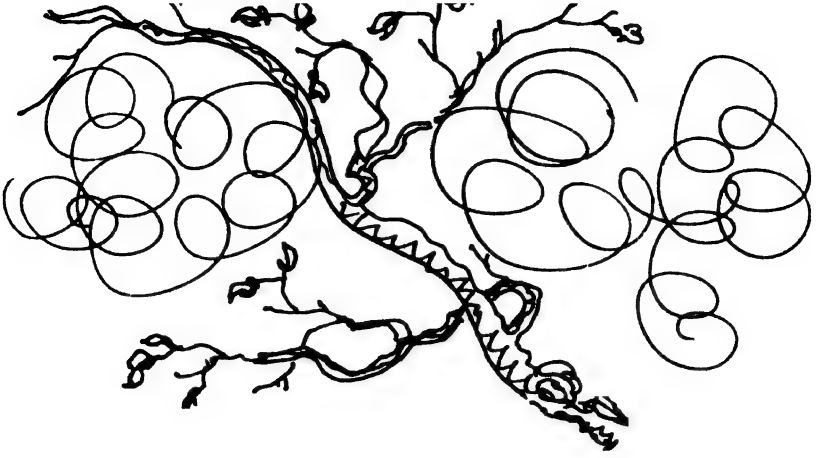

দুঃস্বপ্ন

সমর সেন

মাঝে মাঝে তোমার চোখে দেখেছি
আমার বিষণ্ণ দুঃস্বপ্ন;
তার অদৃশ্য অন্ধকার এত মুহূর্ত
আমার রক্তে হানা দেয়;
আমার ধীমান তোমার সেই দুঃস্বপ্ন
এনেছে পারহীন অন্ধকার।

মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়
মধ্যরাত্রে।
সহসা এসে দেখি
তোমায় ছেয়েছে বর্ণহীন আকাশ
আর হারিয়ে গিয়েছে বিপুল শূন্যতা থেকে;
সে হারানো শুধু নেই শুধু,
কার কেউ শুধু,
কেন সুদূর দিগন্তের কান্না;
সে-কান্না যে আমার ক্লান্তি

আর তোমার সেবা বিনা অনুক্ষণ।

অনুক্ষণের মাঝে আমি তোমার দুঃখসুখ,
তোমার দুঃখসুখ অনুক্ষণের মাঝে আমি।

বিস্মৃতি

সমাপন

ভুলে-যাওয়া গানের মতো
কখনো তোমাকে মনে পড়ে।
হারানো অলকে কখনো আসে দূর ছায়ায় উদ্ভ্রান্ত আভাস।
আর মেঘের রহস্যময় নেশায়
আকাশের নীলিমায় লাগে।
ধূলার রক্তের সাথে রক্তে ফুলের হল,
তাই আর পৃথিবীতে অঙ্কন এল,
বৃষ্টির সাথে শরতের সাথে যে লেখা, সুদূর স্বপ্নের সাথে।

এ রাতি তোমার প্রেমিক
সমুদ্র সেন

বারবার ঘরে ফিরে ঘর ফিরে ঘুরি।

সকালে কলকাতায়
ক্লান্ত সন্ধিবায় কোলাহল করে,
ফিরিওয়ালা ডাকে, সব বাহারের শব্দ শুনি;
মাঝে মাঝে ক্লান্ত ভাবে কি যেন ভাবি —
হে প্রেমের দেবতা, ঘুম না আসলে, ফিসফিস বাণী;
আর শহরের রাস্তায় কখনো বা শ্মশান দেখি
ফিরিয়ে নেয়ে উদ্ভ্রান্ত নরম বুক।
আর মন্দির মসজিদে মাঝে মাঝে বসি;
মূল্যহীন প্রেম থেকে মুক্তি দাও,
পৃথিবীর নতুন পৃথিবী আমার
হয়ো ইশারার মতো উন্মত্ত দিন।
কলতলায় ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্ত ক্ষণ রাত্রি ভুলে
বনিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

স্মৃতি

শামীম সেন

আমার রক্তে যখনি তোমার সুর বাজে।
রুদ্ধশ্বাস, কত কথা যায় হয়ে এলোমেলো,
যায় হয়ে এলোমেলো
মন্থর কত মুহূর্তের দীর্ঘ অবসরে;
স্মৃতির সিঁড়ি বেয়ে এল সত্তার অনুসারে,
আর এলোমেলো,
ভুলে যাওয়ার বেদনা এল ধূসর কথা বেয়ে;
রুদ্ধশ্বাস, কত কথা যায় হয়ে এলোমেলো, কত মুহূর্ত,
প্রাণ হয়ে এল অবসন্ন কত প্রহরের ক্লান্তি,
তবু আমার রক্তে যখন তোমার সুর বাজে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় অভিনব শুধু এই কারণে যে সমর সেনের পরে, এবং আরো প্রবল ও স্পষ্টভাবে, তিনি ব্যক্তিবাদের বিরোধী; তাঁর মুক্তিকামনা একলার জন্য নয়, কোনো বিধাতানির্বাচিত মনীষীসম্প্রদায়ের জন্যও নয়, সমগ্র মনুষ্যসমাজেরই জন্য। সাম্য ও সংহতি ছাড়া মুক্তির অন্য-কোনো সংজ্ঞার্থ তাঁর মনে নেই! ··· সর্বনাশ যে আসন্ন—এমনকি উপস্থিত—এ-বিষয়ে সকলেই সচেতন; আর এই সচেতনতার ফলে নৈরাশ্য ও বিদ্রূপই হয়েছে এ-যুগের কবিতার প্রধান দুটি সুর। কিন্তু এই সর্বনাশই যে নবীন সমাজকে প্রসব করবে, এই বিশ্বাস সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মনে এমনই জ্বলন্ত যে তিনি ব্যঙ্গনিপুণ হ'য়েও নৈরাশ্য থেকে মুক্ত, তাঁর কাব্যকে যা প্রাণ দিয়েছে তা আশার উল্লাস।

বুদ্ধদেব বসু

কবিতা ১৯৪০

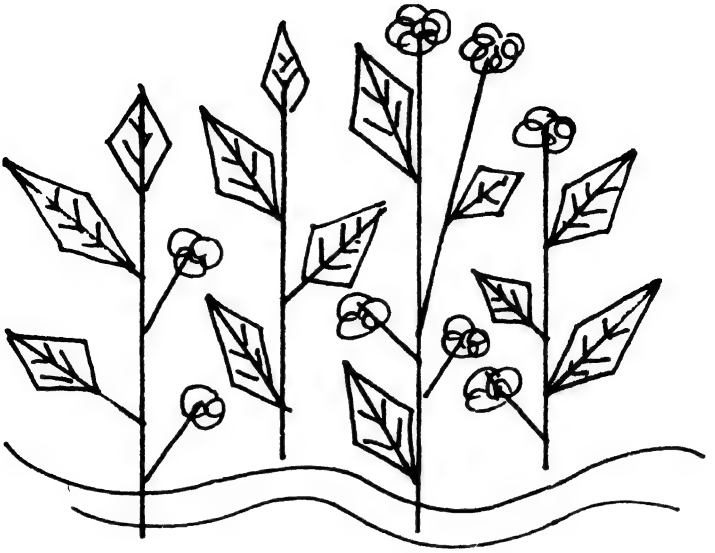

ফুল ফুটুক না ফুটুক

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আসে বসন্ত।

সার-বাঁধানো ফুটপাথে
পাথরে পা ডুবিয়ে
কচি কচি পাতায় পাঁশুটে ফাটিয়ে
হাসছে।

ফুল ফুটুক না ফুটুক
আসে বসন্ত।

আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
অন্ধ

মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে—

যে দিনগুলো রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
ফেরে না ফেরে।

গায়ে-হলুদ-দেওয়া বিকেলে
একটা দুটো পয়সা পেলে
যে হরবোলা ছেলেটা
কোকিল ডাকতে ডাকতে যেত
— ডাকে ডেকে নিয়ে গেছে দিনগুলো।

লাল কালিতে ছাপা
আকাশটাকে মাথায় নিয়ে
এ-গলির এক কালোকুচ্ছিত আইবুড়ো মেয়ে
রেলিঙে বুক চেপে ধ'রে
এইসব সাতপাঁচ ভাবছিল—

ঠিক সেই সময়
চোখের মাথা খেয়ে গায়ে উড়ে এসে বসল
এক মশা। পোড়ামুখ লক্ষ্মীছাড়া পৃথ্বীপতি।

তারপর দড়াম করে দরজা বন্ধ করার শব্দ

অন্ধকারে মুখ চাপা দিয়ে
দাঁড়িপাকানো সেই গাছ
তখনও হাসছে॥

দিনান্তে

পশ্চিমের আকাশে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিয়ে
যেন কোনো দুর্ধর্ষ ডাকাতের মত
রাস্তার মানুষদের চোখ রাঙাতে রাঙাতে
নিজের ডেরায় ফিরে গেল

সূর্য।

তার অনেকক্ষণ পরে
সন্ধ্যার অন্ধকারে
দিনকে রাত করতে
যেন পুলিশের
কালো গাড়িতে এল

সন্ধ্যা।

আলোটা জ্বালতেই
জানলা দিয়ে বাইরে
লাফিয়ে পড়ল

অন্ধকার।

পর্দাটা সরাতেই
চোখধাঁধা হরিণীর মত
আমাকে ঘিরে ধরল

হাওয়া॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দুই পরস্পরবিরোধী সত্তার দুই প্রান্তের নিদর্শন মেলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায়—ক্রোধ, যুদ্ধ, উষ্মার পাশাপাশি স্নেহপ্রবণতা, মানবত্ব ও শান্তির কথা। ব্যক্তিজীবনে, সমাজজীবনেও তিনি ঠিক এমনিই, যে হাতে হাতাহাতি বিরোধ সেই হাতেই বুকে জড়িয়ে ধরা বন্ধুত্ব। তাঁর কবিতার আপাত সারল্যের মধ্যে এমন এক গভীরতা রয়েছে, লঘুচালের আঙ্গিকে এমন এক অন্তরঙ্গতা যা একজন সৎ পাঠককে বহুদূরে নিয়ে যায়। প্রথম জীবনের প্রচণ্ড রোমান্টিক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আজও রোমান্টিক, তবে জীবনের মধ্যপর্বের তীব্র তিক্তকষায় অভিজ্ঞতাগুলি তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বিচিত্র শিল্পরূপ নিয়েছে।

কে জানে অমৃত কতখানি

কে জানে অমৃত কতখানি
উপচে পড়েছে পাত্রপাত্র থেকে ?

সারা রাত ঘুমুতে পারি নি
তবু স্বপ্ন দেখেছি, একটা ঘর, কিছু
এক হাত থেকে
অন্য হাতে তুলবার সেলাম ভরে দিতে গেলে
অসীম হয়ে গেল ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রাত্রি, আমার রাত্রি

ভালবাসার দিনগুলিকে
ফিরিয়ে দেবে কোন নবাব ?
অন্ধ কি শ্মশানের সারিব
মোড়ের আলোর শুকনো কাঠ !

'রাত্রি, আমার রাত্রি' বলে
কণ্ঠ চিরে যতই ডাকো,
কেউ দেবে না সাড়া । সকাই
হাতপিঙ্ক ছুঁড়ে দিয়েছে ।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা

ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি সমস্ত জীবন ধ'রে
একটি বীজ মাটিতে পুঁততাম
একটি গাছ জন্মাতে পারতাম
যেই গাছ ফুল হয়, ছায়া দেয়
যার ফুলে প্রজাপতি আসে, যার ফলে পাখিদের ক্ষুধা মেটে;
ছত্রিশ হাজার লাইন কবিতা না লিখে
যদি আমি মাটিকে দিতাম !

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অন্ধকার বুকের মধ্যে

তোদের মুখের ভালবাসায়
আমার মন ভরে না রে !
আমি তোদের বুকের মধ্যে ঘুমুতে চাই
মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে নয় ।
আমি তোদের বুকের মধ্যে মিশে উঠতে চাই
তোদের মুখের কথা শুনতে নয় ।

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তুমি পিপাসার জল দূর থেকে দ্যাখো
কাঁদে যাওয়া পিতার বরণ;
সেখানে শিকারী বধ্য দিনদুপুরে ওই শোক থাকে
পিতামহ দেখেছেন, মনোহর প্রামের বৃদ্ধেরা।

বুক দুবে যেতে পারে এত পানি
তুমি অনুভব করো তার শীতলতা — তোমার দুপায় বাজে
জাহাজের ধ্বনি।
জাহাজ ভাসে না জলে, পিতার বরণ ...

তোমার ধনুকে কোনো তীর নেই।

১৮ নভেম্বর, ১৯৮২

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

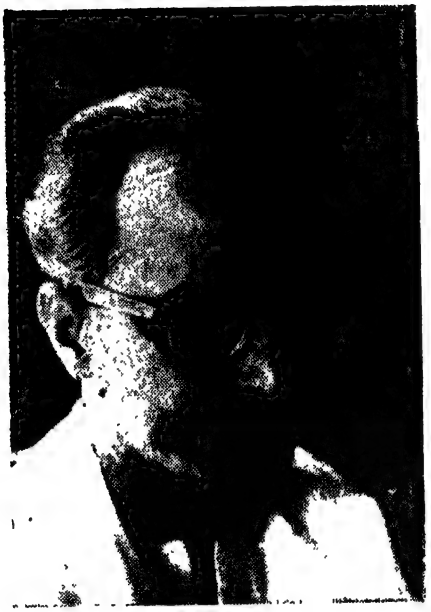

দেড় যুগ আগের মঙ্গলাচরণ ছিলেন বাঙলা কবিতার ভরা আবেগের প্রতিনিধি। বেগার্ত অনুভব, ছিলাটান ছন্দ ও বর্ণাঢ্য শব্দ প্রয়োগের অবারিত দাক্ষিণ্যে তাঁর কবিতা ছিল সচ্ছল ও মুক্তবাধা। আমাদের কাছে একটা বয়সে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও মঙ্গলাচরণ ছিলেন তরুণ কবিতার অগ্নি। এখন একটি সত্য নির্দ্বিধ—কবি মঙ্গলাচরণ প্রবীণ হয়েছেন। এই প্রবীণতা দৃশ্যমান শাসিত আবেগে, ঘন-সন্নিবদ্ধ পয়ারের ব্যবহারে, ব্যক্তি-তন্ময়তা ও অন্তর্মুখীন চৈতন্য চর্চায়, সময়ের দ্বিধা ও সঙ্কটাপন্ন রূপের উন্মোচনে। মঙ্গলাচরণের এককালীন উচ্ছল, আত্মসমর্পিত কবিতার ললাটে চিবুকে এখন অনেক প্রশ্ন-চিহ্ন ও বলিরেখা জমেছে। মঙ্গলাচরণ অবশ্যই পূর্বের ন্যায় সামাজিক এবং মানুষের উত্তরণ ও বিজয়ে বিশ্বাসী। তবে সে বিশ্বাস অতিসরলীকরণে ও নিঃশর্ত সমর্পণে আর নিবেদিত নয়।

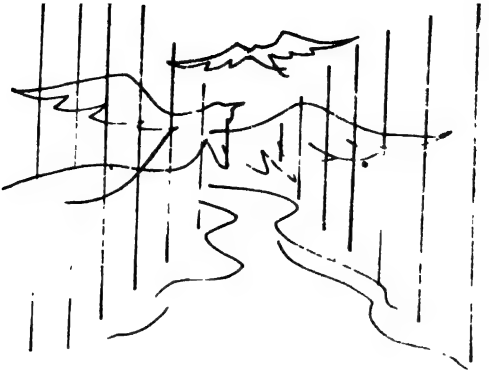

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আমি যেতে চাই, যাই

আমি যেতে চাই, যাব। পথে, পথের দু'পাশে জোড়ে সময়ের
খুচরো কারবারি হাঁকে, উজ্জ্বল দোকান দেয় রেলোয়ারি, যাই
আমি যেতে চাই, তবু আচমকা ঘড়ির পিছুডাক গুঁড়ো-গুঁড়ো
সময়-ভগ্নাংশ গুঁড়ো ঝনঝনায় ছড়ায় পায়ের নিচে, যাই
যেতে চাই আর ট্র্যাফিক-সিগন্যাল, রোখো, অফিস-ইস্কুল-ক্লাস
আড্ডা ও রেডোয়াঁ, রোখো, 'কেমন ভালো তো?' 'ভালো',
'আছো তো?' 'আছি'—
দেখি দূরে গেল বাস, শেষ ট্র্যাম, কাল ছেঁড়ে ট্রেনের পুইশল
যায়, যেতে চাই, যাই, পাই কি পাই না পতি সময় সংহতি
দূরে চৈতন্যের প্রত্যন্ত স্টেশন।

#২

তবু যেতে হয়, যাই। মুহূর্তে-মুহূর্তে ছিঁড়ে যাওয়া, যাওয়া। যাই
কথার ঝলক, টুকরো নীরব, হঠাৎ কথা এ-পথে সবাই
আকস্মিক ফুল তার ফেলে-যাওয়া জলবায়ু লীন পথরেখা
কেবল আমার যাওয়া পথে মনে মনপাত্রে মন থেকে পথে
আমার কেবল যাওয়া কথা ও ফুলের দিকে মনের ভিড়িলে
মুহূর্তের পাপড়ি খুলতে-খুলতে শতদল যাওয়া, যাওয়া, যাওয়া। যাই
দূর চৈতন্যের প্রত্যন্ত স্টেশনে।

আমার প্রত্যহ তুমি, সহচরী ধর
খরৌদ্র কথা স্নেহ কলরব কথা
নিশ্বাস আয়াস তুমি আগলে আছ সমস্ত দরজা
দরজা — প্রস্থান নেই প্রবেশ নিষেধ।
তবু রৌদ্রে উষ্ণ ছায়া ছায়ায় তলিয়ে স্তব্ধ
অন্তরঙ্গ অবকাশ
স্তব্ধ ও স্নেহের চোখ হাত ও স্তব্ধ
সমস্ত মাঠের পর
অজস্র মাঠের পর
সমস্ত উপরিতল গলিয়ে তলিয়ে
প্রভার পাতাল — মূল
অন্ধকার গহন শিকড়
অন্ধকারে :
যেন-বা নিহিত ফল্গু
সমুদ্র অদৃশ্য ফল্গু
সমুদ্রের দিকে নদী — নদী নদী নদীই সমুদ্র ;
যেন মাতৃগর্ভে ভ্রূণ
জরায়ুজটিল খাঁচা
রক্তের তোড়ে তবু জননীর হৃদয়ে ছলাৎ ;
যেন মৃত্যু
ফিরে-ফিরে
অন্ধকার
মৃত্যুর সুরঙ্গ ফিরে
সহসা ভুলের পলি স্বাদের শিকড়
আবার সবুজ স্রোত শিহরন শিমা
মাটি ও মানুষ — মম
খরৌদ্র কথা স্নেহ কলরব কথা
নিশ্বাস আয়াস তুমি খুলে আছ সহে-সহে সমস্ত দরজা

আকাশ-কোলে দিগন্ত
পড়ছে যখন-তখন দিনান্তে
ছ আবার আকাশ শুধু-মেঘেরই রঙ্গপাড়ে
ড়-দৌড়ে ইলশেগুঁড়ির ছিরছির ঝরনাতে
পাখির গানেই খুশি
ঢালছে না জল ঝলমল-ঝলমল মেঘের কুয়োতলায়
সন্ধেসকাল গা-টা ধুয়ে ঘলসিতে জল ভরে
ফিরছে না সে এ-ঘরে ছাঁচতলায়।
বিরাগী — ঘর পালায়
ঘন কালোয় ভরি আকাশ ধরতে গেলেই পালায়।
#>
অন্ধকারের আকাশমাখা নদী —
চুমে মেঘের ঢেউ দে' আলোবাগার বিজলি হেসে
বুকে ঝঙ্কার বজ্র শোনায় যে
মাটির শিরা-উপশিরায় ঘাসের শিহর-শিখে
দেয় ছড়িয়ে শীতল শীতল প্রাণ
শুধায় ধ-রেখে বুকে শোনায় মেয়েমানুষ মোহ —
এমন-যে এক ঘরছাড়া আর প্রাণমজানো নদী
নদী কথা বলে না
বালুর কাঁথামুড়ি ও তার ঘুরে পুড়ছে গা
নদী মুখটি তোলে না।
#>
বছর-বছর কপাল আগুন, মনটা ছেঁটা-ছেঁটা করেই সারা
গাছের ঘরের শিল্পীর হাত আঁকতে শতেক রঙকেরের সবুজ
দিচ্ছে প্রাণে দিক-দিক হলুদবর্ণ ছিটে
আকাশচাওয়া জীবনটাকে লাগছে কেমন বিশ্রী পাতাঝরা।
অনেকটা পথ যাওতে হবে, অনেক অনেক আরও —
আকাশ দৌড়ে কোনদিকে যায়, নদীর জলের ঘলসি কোথায়
খুঁজতে-খুঁজতে যেতে যেতে যেতে
তুলতে হবে বুকটা খুঁড়ে
বুকের শুকনো কুয়োর উবাও জলও।
#>
অনেক বলির রক্ত, ঘরের মানত চাইছে খরা।

এখন ভাঙন

কেবল ভাঙার শব্দ দিগ্বিদিকে। বিস্ময়প্রাচীর পড়ছে। ভয়।
সদ্য একটা বনস্পতি টুকরো হয়ে, টুকরো-টুকরো হয়ে, মূলসুদ্ধ
উপড়ে, ছায়া জল পাতা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দুমড়ান। ধুলো উড়ছে
ধোঁয়া উঠছে, বোধবুদ্ধিহৃদয়মনীষা উপড়ে ভয় — ভয়ঙ্কর
ধুলো উড়ছে। না, আর আশ্রয় নয়। ছায়ার আড়ালে সেই ধোঁয়া।
আত্মহত্যাশেষে ফুল ঘরের দুইহরুম রক্তিম প্লাস্টিকে
সাজায়, বাজায় সুর বেতুল অর্গ্যানে গান, বাজে বেলোয়ারি
প্রত্যেক মুহূর্ত প্রতি ভয়ের মুহূর্ত — ভেঙে পড়তে-পড়তে প্রাণ

#>

প্রাণ তবু পথ ভাঙছে। বাড়ি পড়ছে। পার হচ্ছে স্ক্যাফোল্ড-কাঁটায়
ইটে ভগ্ন মূল্যবোধে নগ্ন মাঠ, প্রত্যাশার চোরাবালি, পার
হয়ে যাচ্ছে বিধ্বস্ত স্নায়ুর দেশ রোমহর্ষবর্ষিত সময় —
না, আজ প্রলয় নয়। এখন ভাঙন। ভাঙতে হচ্ছে পোড়ো বাড়ি
মুখ ও দর্পণ, মুখ, শরীরে আসবাব বুকের মরুদ্যে দীর্ণ
রক্তের অ্যাসফল্টে পাশে, ভাঙো ভাঙো, ভাঙতে হচ্ছে এখন ভাঙন।

#>

জন্মের আদিম দেনা শুধতে ফিরে যেতে হচ্ছে মাটি আর মানুষের দিকে।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কবিতা লেখার আগেই কবির মনের মধ্যে পেঁাছে যায় একটা সুর—যা তাঁকে ঠেলে দেয় সমঞ্জস শব্দের নির্মাণে। বিষয় থেকে আঙ্গিক নয়, আঙ্গিক থেকেই বিষয়বস্তু—লেখার ব্যাপারটা এ রকম উলটো করে দেখেছিলেন এডগার এলান পো। পো-র সঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর অভিজ্ঞতাও মেলে। তাঁরও কবিতার ভাষা নিয়ন্ত্রণ করে ভাষা-পূর্ব একটা সুর—কখনো তা বিষাদ, কখনো প্রত্যাশা বা বিদ্রূপ। বিলুপ্ত নীলিমায় শিল্পীর ভূমিকা পালন করতে গিয়ে কবি প্রাত্যহিককেই সাংকেতিক করে তোলেন। দিন যাপনের কথা সরাসরি বলতে গিয়ে তিনি কোন শব্দ বা শব্দবন্ধ দুলিয়ে দেন সাংকেতিকতায়। বড় নিপুণ হাতে বাজান শব্দের সঙ্গীত—যা শুনতে শুনতে মনে হয় অন্ধকারই তাঁর কবিতার শেষ কথা নয়, তাঁর মনের গতি আলোর দিকে।

মিলিত মৃত্যু

বরং দ্বিমত হও, অসহযোগ করো দ্বিতীয় দিয়ায়
বরং বিচলিত হও তাড়ির পাখায়।
বরং বুদ্ধির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো
সম্ভব এর সবই করো, সমস্ত কথায়
অনায়াসে সম্মতি দিও না।
কেননা, সমস্ত কথা যারা অনায়াসে মেনে নেয়,
তারা আর কিছুই করে না,
তারা আত্মহননের পথ
পরিষ্কার করে।

#

যেমনটি শ্রুতিসুখ কথা বলা যায়।
ভেড়ু এবং সুখী কাঠামোকে এক হতে দিয়েছিল।

তারা বেঁচে নেই
প্রথম দৃশ্যের পাত্রপাত্রী
দৃশ্যের এবং সাজ বিদিদের মধ্যে কোনো বিভেদ রাখেনি
তারা বেঁচে নেই।
চিন্তায় একাত্মতা হতে গিয়ে কেউই বাঁচে না।
#
যে ঘর আপন রাখি বেঁচে থাকা তাল, এই জেনে
নিশ্চিত মৃত্যুর থেকে বেঁচে থাকা ভাল, এই জেনে—
তাহলে দ্বিমত হত, আস্থা রাখে দ্বিতীয় বিস্ফোরে
তাহলে বিস্মিত হত অস্থির পাথর।
তাহলে শান্তিত করা বুদ্ধির নয়।
প্রতিবাদ করো।
#
এই দ্যাখো কয়েকটি অভিজাত সিঁড়ি
অভিজাতিকলনাবুদ্ধি যুবক-যুবতী হেঁটে যায়।
পরস্পরের সব ইচ্ছায় সহজে তারা দিয়েছে সম্মতি
তারা আর তাকাবে না ফিরে।
তারা এমনও হবে, তারা এমনও হবে, তারা
এমনও হতে-হতে কুত্তুবের সিঁড়ি
বেয়ে উঠে উঠে যাবে, লাফ দেবে শূন্যের শরীরে

কলকাতার চিত্র

লালবাতির নীচেই দিল না,
তবুও বাড়ের বেগে বীরদর্প কলকাতা শহর
এতটিতে ঘোরে গেল;
ভয়ঙ্করভাবে ঘিরল সামনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্রাফিক ও ট্রাফিকের, পুলিশ, নয়নমণি ডবল-ডেকার।
'গেল গেল' সর্বনাশে রাস্তার দু'দিক থেকে খড়
ছুটে এসেছিল —
কাঁকাবুটে, ফিরিওয়ালা, দোকানি ও খরিদ্দার —
এখন তারাও যেন ছিন্ন চিত্রটির মতো শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
ঘোলাটে আলো
[illegible]
রাস্তার এক-পার থেকে অন্য-পারে হেঁটে চলে যায়
সমস্ত উলঙ্গ একটি শিশু।
#
আবার আসেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়
এখন রোদ্দুর যেন অতীব্র বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে [illegible]
নেমে আসছে;
মাঝারী আলোয় ভেসেছে কলকাতা শহর

#

স্টেশনের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তাকাই
ভিখারী মায়ের দিকে,
কলকাতার দিকে,
সমস্ত পৃথিবীকে তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ
জগতের আর্তনাদ, অসংখ্য ট্রাইজেডির দাঁতের খচখচানি,
কিছুই ক্রমশ নেই ;
দু-দিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
চলতে চলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমস্ত বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
চীনমাটির পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্য-কিনারে চলেছ।

—

শীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী